তৃতীয় অধ্যায়

অনন্ত সময়ের উপহার

বন্যা আহমেদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের (বিবর্তনে প্রাণের স্পন্দন) পর....

ছয় হাজার বছর বনাম কোটি কোটি বছর! মানুষের সীমিত ৭০-৮০ বছরের জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকশো কোটি বছর হাতে পাওয়াকে অনন্ত কাল বলেই তো মনে হওয়ার কথা। আগের অধ্যায়ে আমরা জেমস হাটন আর চার্লস লায়েলের কথা শুনেছি, তারাই দিয়েছিলেন ডারউইনকে এই মূল্যবান 'সুদীর্ঘ সময়ের' উপহার। অনেকে মনে করেন ডারউইন এদের কাছ থেকে এই অমুল্য উপহারটা না পেলে তিনি তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বটা এত সহজে প্রমাণ করতে পারতেন না! প্রাণের বিবর্তন ঘটতে, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি তৈরি হতে লাগে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর! ডারউইন কিভাবে বিবর্তন এবং তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতেন যদি তার মাথাটা বাইবেলের এই ছয় হাজার বছরের গন্ডিতেই আটকে থাকতো? একটা বৈজ্ঞানিক মতের পূর্ব শর্তটাই যদি পূরণ করা না যায় তাহলে তত্ত্ব হিসেবে তাকে উপস্থাপন করা হবে কি করে? আদম হাওয়াকে না হয় আল্লাহ বা ঈশ্বর চোখের পলকে তৈরি করে টুপ করে পৃথিবীর বুকে ফেলে দিতে পারে, কাল্পনিক গল্প ফাঁদতে তো আর সাক্ষ্য প্রমানের দায়ভার থাকে না! কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মানুষের সামনে হাজির করতে হলে তো লাগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, প্রমাণ এবং যুক্তির সমন্বয়! ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের বুড়ো পৃথিবী কখন এই কাল্পনিক ছয় হাজার বছরের বেড়াজালে বাঁধা পড়ে গেলো; কখন তার অসীম ব্যাপ্তি বিলীন হয়ে গেলো মানুষ নামের এই দ্বিপদী প্রজাতিটার কল্পনা, কুসংস্কার আর ক্ষুদ্রতার মাঝে? খুব বেশীদিন আগে কিন্তু নয়, ১৬৫৪ সালে আইরিশ ধর্মজাযক জেমস আসার বাইবেলের সব জন্মতালিকা হিসেব কষে বের করেছিলেন যে আমাদের পৃথিবীর বয়স নাকি ছয় হাজার বছর! অবশ্য মনে করা হয় যে এই ধরনের একটা গল্প ইউরোপীয় সমাজে হয়তো আরও আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো, কারণ এর বেশ কিছুদিন আগে লেখা শেক্সপীয়ারের As You Like It নাটকে ছয় হাজার বছর বয়সের পৃথিবীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবে জেমস আসারই এই ধারণাটাকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন, এবং তার ফলাফল হলো ভয়াবহ - বিশেষ করে ভুতত্ত্ববিদ্যার ভবিষ্যৎ মুখ থুবড়ে পড়লো আরও কয়েকশো বছরের জন্য। আর তার হাত ধরে পিছিয়ে পড়লো বিবর্তনবাদসহ জীববিজ্ঞানের অন্যান্য অগ্রগতি।

আসলে তো বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের এই সংঘাত কোন নতুন ঘটনা নয়। ধর্ম কোন যুক্তি মানে না, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে অন্ধ বিশ্বাস; আর এদিকে বিজ্ঞান হচ্ছে ঠিক তার উলটো, তাকে নির্ভর করতে হয় যুক্তির পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের উপর। কোন প্রকল্পকে (hypothesis) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (theory) জায়গায় উঠে আসতে হলে তাকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট স্তর পার হয়ে আসতে হয় - প্রথমে গভীর পর্যবেক্ষণ, যুক্তি, সমস্যার বিবরণ, সম্ভাব্য কারণ, ফলাফল ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্রকল্পটা প্রস্তাব করা হয়, তারপর তাকে প্রমাণ করার জন্য চলতে থাকে ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষা। বিভিন্ন পরীক্ষার থেকে পাওয়া ফলাফল এবং তথ্যের মাধ্যমে যদি প্রকল্পটাকে প্রমাণ করা না যায় তাহলে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি দীর্ঘ দিন ধরে বারবার করে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করা যায় এবং অন্য

কোন বিজ্ঞানী এই প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন তথ্য হাজির না করেন তবেই তাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়, তার সাক্ষ্য প্রমানের দায় কখনই শেষ হয় না, বিজ্ঞানে বিমূর্ত বা অনাদি সত্য বলে কোন কথা নেই। এই প্রক্রিয়ায় একটা প্রচলিত এবং প্রমাণিত তত্ত্বকেও যে কোন সময় আংশিক বা সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণ করা যেতে পারে, আজকে একটা তত্ত্বকে সঠিক বলে ধরে নিলে কালকেই তাকে ভুল প্রমাণ করা যাবে না এমন কোন কথা নেই। তাই আমরা দেখি, নিউটনের তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার জগতে কয়েকশো বছর ধরে রাজত্ব করার পরও আইনস্টাইন এসে বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে তার অসারতা প্রমাণ করে দিতে পারেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম উদাহরণের কোন শেষ নেই, কারণ

> বিজ্ঞান কোন তত্ত্বকে পবিত্র বা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেনা, বিজ্ঞান ধর্মের মত স্থবির নয়, সে গতিশীল। এখানেই তার সাথে ধর্মের পার্থক্য। ধর্ম মানুষকে প্রশ্ন করতে বারন করে, হাজার বছরের পুরনো ধ্যান ধারনাগুলোকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়াই ধার্মিকের দায়িত্ব।

প্রশ্ন করা যাবে না সৃষ্টিকর্তা কিভাবে সৃষ্টি হল, পৃথিবী আসলেই সমতল কিনা, ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা মত আসলেই সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে কিনা! চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে যে একজন সৃষ্টিকর্তার হাতে মাত্র ছয় হাজার বছর আগে সমস্ত জীবের সৃষ্টি হয়েছিলো, আর তারা অপরিবর্তিত অবস্থায়ই রয়ে যাবে অনাদিকাল ধরে। হাজারো সাক্ষ্য প্রমান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এর সবই ভুল, সবই মানুষের আদিম অজ্ঞানতার ফসল, কিন্তু তবুও এই মিথ্যাকেই যেনো মেনে নিতে হবে! আশার কথা হচ্ছে, কিছু সচেতন এবং সাহসী মানুষ বহু অত্যাচারের সম্মুখীণ হয়েও মিথ্যা এবং অন্যায়ের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, আর তারই ফলশ্রুতিতেই এগিয়ে গেছে মানব সভ্যতা। তাই আমাদের এই সভ্যতার ইতিহাস হাজারো রক্তাক্ত সংঘাতে ভরা - কোপার্নিকাস তোমরে গিয়ে বাঁচলেন চার্চের রোষানল থেকে, মৃত্যুশয্যায় শোয়ার আগে তিনিও সাহস করেননি সৌরকেন্দ্রিক মতামতটি প্রকাশ করতে! বৃদ্ধ গ্যলিলিও হাটু গেড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ ভিক্ষা পেলেন, সাহসী ব্রুনোকে তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে ....

সে যাই হোক, এখন তাহলে দেখা যাক, এই যাত্রায় মানব সভ্যতা কি করে বেড়িয়ে এসেছিল ছয় হাজার বছরের ভয়াবহ চক্রাবর্ত থেকে। চট করে একবার ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেই আমরা দেখতে পাবো এখানেও সেই একই কাহিনী, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সেই সংঘাতময় দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সতেরশো শতাব্দীতে ধর্মভীরু জেমস আসার যখন বাইবেলের জেনেসিস (বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টতত্ত্বের উপর অংশ) থেকে হিসেব কষে পৃথিবীর বয়স বের করলেন তখন কিন্তু তার মনে সংশয়ের সৃষ্টি হল না। তিনি প্রশ্ন করলেন না যে তথ্যের ভিত্তিতে তিনি গণনা করছেন তা কি করে বা কোথা থেকে আসলো - দেড় হাজার বছর ধরে বাইবেলে স্রষ্টার বচন বলে যা বলা আছে তাকেই তিনি পরম সত্য বলে মেনে নিলেন। এর বেশ আগেই অন্ধকার মধ্যযুগের ইতি ঘটে গেছে ইউরোপে, রেনেসাঁর যুগ মোটে শেষ হয়েছে, আর বিজ্ঞান হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কোপার্নিকাস, গ্যলিলিওর মত কিছু সাহসী বিজ্ঞানীর হাত ধরে পদার্থবিদ্যা এগিয়ে যেতে শুরু করলেও, জীববিজ্ঞান এবং ভুতত্ত্ববিদ্যা তখনও ধর্মের অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারপুর্ণ ব্যাখ্যার কারাগারেই জিম্মি থেকে গিয়েছিল। পৃথিবীর বয়স, প্রাণের সৃষ্টি, বিকাশ, প্রজাতির সৃষ্টি বা বিলুপ্তির ব্যাখ্যার জন্য মানুষ তখন বাইবেল, কোরান বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে বলা কাল্পনিক গল্পগুলোরই স্মরণাপন্ন হত। ষোলশ শতাব্দীর ইউরোপে যে কোন মানুষকে এ সম্পর্কে

প্রশ্ন করলে আপনি জেনেসিসের গল্প ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেতেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ইউরোপীয়ানদের জিজ্ঞেস করলেই হয়তো পেতেন বেশ অন্য ধরণের একটা উত্তর - পৃথিবীর বয়স আসলে অনেক অনেক বেশি, বাইবেলের কথাগুলোকে রূপক হিসেবেই নেওয়া উচিত, বিজ্ঞানের সাথে একে গুলিয়ে ফেলার কোন দরকার নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চিন্তার এই উত্তোরণ কিন্তু একদিনে ঘটেনি। আসলে, বিজ্ঞানমনস্ক কিছু মানুষ আরও অনেক আগে থেকেই এ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে সেই ১৫১০ সালেই লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (Leonardo Da Vinci, 1452 - 1519) সামুদ্রিক প্রাণী এবং ভুত্বকের বিভিন্ন স্তরের শীলাস্তুপ পরীক্ষা করে তার ডাইরি তে লিখেছিলেন, পৃথিবী মোটেও ছয় হাজার বছরে বা নুহের প্লাবন থেকে তৈরি হয়নি, এর তৈরি হতে লেগেছে তার চেয়ে ঢের বেশি সময় (৯)। তারপর সতেরশো এবং আঠারশ শতাব্দীতে রেঁনে দেকার্তে (Rene Descartes, 1596 - 1650) থেকে শুরু করে বুঁফো (Comte de Buffon, 1707 - 1788), কান্ট (Imanuel Kant, 1724 - 1804) পর্যন্ত অনেকেই তখনকার দিনের সীমিত জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীর বয়স নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন (৩)। তাদের মধ্যে অনেকেই ভুপৃষ্ঠ কিংবা পাহাড়ের গঠন, ক্ষয়, শীলাস্তর, ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে পাওয়া ফসিল ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বয়সের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। এত বড় বড় পরিবর্তন এত কম সময়ে ঘটা সম্ভব নয় - পৃথিবীর মাটি এবং জলের মধ্যে বহুবার স্থান বদল হয়েছে, আজকে যে পাহাড়গুলো মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে তারা অনেকেই হয়তো একসময় সমুদ্রের নীচে ছিলো! বুঁফো ১৭৭৪ সালে উত্তপ্ত অবস্থা থেকে পৃথিবীর ঠান্ডা হয়ে এই অবস্থায় আসতে কত সময় লাগতে পারে তার হিসেব করে প্রস্তাব করেন যে, পৃথিবীর বয়স ৭৫ হাজার বছর বা তারও বেশী হবে(১০)।

তার পরপরই ১৮০০ শতব্দীর বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চে পা রাখেলন ভূতত্ত্ববিদ জেমস হাটন (James Hutton, 1726-1797), তিনি তার সারা জীবনের ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জ্ঞান থেকে ১৭৮৫ সালে বললেন - পৃথিবীর বয়স আসলে অনেক অনেক বেশী, পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে যে রকমের ব্যাপক পরিবর্তন এবং বিবর্তন দেখা যাচ্ছে তা কোন মতেই কয়েক হাজার বছরের সৃষ্টি হতে পারে না, বহু কোটি বছর ধরে ধীর গতিতে এই পরিবর্তন ঘটে আসছে।

> অনেকে মনে করেন জেমস হাটনই হচ্ছেন ভূতত্ত্ববিদ্যার জনক এবং তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাইবেলের বিপর্যয়বাদ বা প্রলয়বাদের বিরোধিতা করে deep time বা সুদীর্ঘ সময়ের ধারণার প্রচলন ঘটান। তিনি বললেন, আরম্ভেরও যেমন কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না তেমনি শেষ হওয়ারও কোন ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। সে সময় পৃথিবীর বয়স হিসেব করে বের করার মত প্রযুক্তি হাতে না থাকায় তিনি ধরে নেন যে এর বয়স অসীম।

নারায়ণ সেন তার লেখা 'ডারউইন থেকে ডি এন এ' বইটিতে (রেফারেন্স দ্রঃ) চমৎকার কিছু পরিসংখ্যাণ এবং উদাহরণ দিয়েছেন - 'বিশদ ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সূত্রে হাটন বুঝেছিলেন প্রকৃতি আদতে ধীর গতিতে পৃথিবীর চেহারা পালটায়, যতই আমরা ঝড়, ঝঞ্ঝা, তুফানে কাতর হই না কেন। এই ধীর গতির রূপটি কয়েকটি আধুনিক পরিসংখ্যাণ থেকে বোঝা যাবে। জমির ক্ষয়ের কারণে, গড়পড়তায়

প্রতি হাজার বছরে, নিচু জমিতে আনুমানিক মাত্র এক থেকে তিন সেন্টিমিটার এবং পাহাড়ি এলাকায় কুড়ি থেকে নব্বই সেন্টিমিটার মতো উত্তোলিত হচ্ছে। পৌরাণিক কাল থেকে হিমালয়ের সম্ভবত তিনশো থেকে চারশো মিটারের মত উচ্চতা বেড়েছে। বস্তুত ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বলছে ছয় কোটি বছর আগে হিমালয়ের তখনকার মাটি ও স্তর সমষ্টি সমুদ্রের তলদেশে ছিল' (১)। কিন্তু এসব পরিসংখ্যাণ তো তখন হাটনের হাতের সামনে ছিলো না, সে সময়ের রক্ষণশীল ইউরোপীয় সমাজ তাই হাটনের মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করে এবং এক সময় দেখা যায় তার নাম ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় মুছেই দেওয়া হয়েছে।

প্রায় এক প্রজন্ম পর যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন লায়েল। ১৮৩০ সালে লায়েল বললেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনগুলো ক্রমাগতভাবে ধীর প্রক্রিয়ায় অসীম সময় ধরে ঘটেছে, বাইবেলের পথ ধরে শুধুমাত্র নুহের মহাপ্লাবনের প্রলয়বাদ দিয়ে এদেরকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্য শুধু এই ধীর এবং ক্রমাগত প্রক্রিয়াকেই ভূস্তরের পরিবর্তণের একমাত্র কারণ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন যা পরে ভুল বলে প্রমানিত হয়; আসলে ধীর এবং আকস্মিক - দুই পদ্ধতিতেই কোটি কোটি বছর ধরে এই পরিবর্তন ঘটে আসছে। লায়েল সে সময় অত্যন্ত সুচারুভাবে তখনকার রক্ষনশীল ধার্মিক সমাজে তার এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সে সময় চার্চ্চের মধ্যযুগীয় প্রবল প্রতাপ যেহেতু দুর্বল হয়ে আসতে শুরু করেছিলো তাই তাকে ব্রুনো বা গ্যালিলিওর মত অবস্থার শিকার হতে হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞান তো আর সেখানে থেমে থাকেনি। ১৮৬২ সালে লর্ড কেলভিন তাপগতি বিদ্যার (Thermo dynamics) সূত্র ব্যবহার করে পৃথিবীর বয়স ৯৮ মিলিয়ন বা ৯ কোটি ৮০ লক্ষ বছর বলে ঘোষণা করলেও পরে ১৮৯৭ সালে তাকে সংশোধন করে ২০ -৪০ মিলিয়ন বছরে নামিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) প্রথমবারের মত রেডিও অ্যাকটিভ পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স মাপার কথা প্রস্তাব করেন। তার কয়েক দশকের মধ্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীর বয়স আসলে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বা সাড়ে চারশো কোটি বছর (১০)।

সে যাই হোক, এবার আবার ফিরে আসা যাক ডারউইনের গল্পে। হাটন এবং লায়েলের এই অবদানের হাত ধরেই চার্লস ডারউইন প্রকৃতিবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানকে নিয়ে গেলেন এক নতুন স্তরে। তারাই উন্মুক্ত করে দিলেন অসীম সময় নিয়ে কাজ করার বহু শতাব্দীর বন্ধ দুয়ারটি। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে বীগেল যাত্রা থেকে ফিরে আসার সময়েই ডারউইন ক্রমশঃ জীবজগতের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উঠছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে শুরু করেছেন যে, জীবজগৎ স্থির নয়, কোন দিন ছিলোও না, সৃষ্টির আদি থেকেই এর বিবর্তন ঘটে আসছে। ইংল্যান্ডে ফিরে এসেই তিনি সারা পৃথিবী ঘুড়ে সংগ্রহ করা নমুনাগুলো নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে লেগে যান। ১৮৩৮ সালে, আমরা দেখি, প্রথমবারের মত ডারউইন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লিখছেন,

> 'এভাবেই মূল প্রজাতি থেকে প্রকারনরা (variation) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন প্রজাতির জন্ম হয়, আর মূল প্রজাতিটি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং তার ফলে টিকে যাওয়া প্রজাতির মধ্য বিচ্ছিন্নতার পরিমান বৃদ্ধি পায় ...'(২). তিনি নিঃসংশয় ভাবে বললেন প্রজাতি এক জায়গা থেকে

আরেক জায়গায়, একযুগ থেকে আরেক যুগে অভিযোজনের (adaptation) মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু এখন সমস্যা হল কিভাবে সবাইকে তিনি বোঝাবেন যে এতো দিন ধরে তোমরা যা বিশ্বাস করে এসেছো তা সবই ভুল! তোমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো শুধু কল্পনাপ্রসুতই নয় চরম মিথ্যা আর ধোঁকায় ভরা! তিনি কি জানেন না বাইবেলকে চ্যালেঞ্জ করার পরিণতি, তিনি কি ভুলে গেছেন তার পূর্বসুরী কোপার্নিকাস, বৃদ্ধ গ্যলিলিও বা সাহসী ব্রুনোর কথা! তাহলে ডারউইন এখন কি করবেন?

১৮৩৭ থেকে ১৮৫৮ - দীর্ঘ ২০ বছর! ডারউইন মনোনিবেশ করলেন তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায়। লোকজনের সাথে বেশী মেশেন না, নিজের মনে গাছপালা, পোকা মাকড় নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এমনকি লন্ডন থেকে ১৬ মাইল দুরে বাড়ি কিনে পরিবার নিয়ে উঠে আসেন নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু বারবারই অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলেন তিনি, সে এক অদ্ভুত অসুস্থতা, প্রায়ই শরীরটা খারাপ থাকে, মাথা ব্যথা, পেটের অসুখ কখনই নাকি পিছ ছাড়ে না! কোন ডাক্তারই অসুখটা কি তা ধরতে পারেন না। অনেকেই এখন মনে করেন যে তার অসুখটা হয়তো ছিলো নিতান্তই মানসিক, এত বড় একটি আবিষ্কারকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অসহ্য ভার আর বইতে করতে পারছিলেন না তিনি। খুব সাবধানে এবং গোপনে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন তিনি। ভূতত্ত্ব এবং জীববিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের উপর অন্যান্য বই প্রকাশ করতে থাকলেও তার এই বিবর্তনের উপর কাজ সম্পর্কে লায়েল, হুকার, বা হাক্সলির মত দুই চারজন বিজ্ঞানী বন্ধু ছাড়া আর কাউকে কিছু জানাতেন না তিনি। বিবর্তন যে ঘটছে তা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও কি প্রক্রিয়ায় তা ঘটছে বা এর চালিকাশক্তি কি হতে পারে তা সম্পর্কে তখনও কোন নির্দিষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে পারেননি। সিদ্ধান্ত নিলেন, বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত তথ্য প্রমাণসহ একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করতে না পারা পর্যন্ত কোনভাবেই এই আবিষ্কারের কথা জনসমক্ষে প্রচার করবেন না। তাই পরবর্তী বিশ বছর ধরে তিনি অত্যন্ত গভীর অধ্যাবসায়ের সাথে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো চালিয়ে যেতে থাকলেন।

১৮৫৮ সালে অপ্রত্যাশিত একটি চিঠি এসে পৌঁছায় ডারউইনের হাতে । তার ভিতরে ছিলো আলফ্রেড ওয়ালেসের (১৮২৩-১৯১৩) বিবর্তন নিয়ে লেখার একটি পান্ডুলিপি। ডারউইন বিস্ময়ের সাথে দেখলেন যে আজকে ২০ বছর ধরে যে তত্ত্ব নিয়ে তিনি গোপনে কাজ করে আসছেন তা মাত্র তিন বছরেই ওয়ালেস আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তিনি অত্যন্ত আশাহত মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন পর্যন্ত করা সব কাজ ধ্বংস করে ফেলবেন। কিন্তু এরপর বন্ধুদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত 'On the origin of species by means of Natural Selection বা প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করে ফেলতে রাজী হলেন। তখনই ঠিক করা হয় যে, ১৮৫৮ সালে লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির এক অধিবেশনে ডারউইনের এবং অ্যলফ্রেড ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩) এর বিবর্তনবাদ তত্ত্ব আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তাব করা হবে। অনেকে মনে করেন প্রজাতির উৎপত্তি বইটিতে ডারউইন যেভাবে অগুনতি উদাহরণ, পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে তার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ওয়ালেস তার ধারে কাছেও যেতে পারেন নি। ডারউইন এত বিস্তারিতভাবে বইটি না লিখলে শুধুমাত্র ওয়ালেসের লেখা দিয়ে যুগান্তকারী এই বিবর্তনবাদ তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারতো না। ওয়ালেস নিজেই পরবর্তীতে 'ডারউইনবাদ' নামক একটি বই লেখেন এবং তাতে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মূল কৃতিত্ব যে ডারউইনেরই তা স্বীকার করে নেন (৩)।

এখন তাহলে দেখা যাক ডারউইন এমন কি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে, যার ফলে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেলো চিরতরে। তিনি তার সময়ের থেকে এতখানিই অগ্রগামী ছিলেন যে, তার এই আবিষ্কারের প্রমাণ পেতে বিজ্ঞানীদের আরও প্রায় এক শতক সময় লেগে গেলো! ডারউইন দেখলেন, হাজার হাজার বছর ধরে কৃষকেরা এবং পশু পালকেরা কৃত্রিম নির্বাচনের (artificial selection) মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বাড়িয়েছে, গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রয়োজন মত বিভিন্ন জাতের প্রাণীর সৃষ্টি করেছে। সে সময়ে জীববিজ্ঞান কিংবা জেনেটিক্স সম্পর্কে কিছুই না জেনেও, তারা শুধুমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সঠিকভাবেই বুঝেছিলো যে, অনেক বৈশিষ্ট্য বংশগতভাবে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে প্রবাহিত হয়। যেমন, যে ধানের গাছের জাত থেকে অনেক বেশী বা উন্নত মানের ধান উৎপন্ন হয়, ক্রমাগতভাবে শুধু সে ধরনের ধানের বীজই যদি চাষের জন্য নির্বাচন করা হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে শুধু উন্নত মানেরই ধান উৎপন্ন হচ্ছে। যে গরু বেশী দুধ দেয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যদি শুধু সেধরনের গরুকেই বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়া হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে যে পুরো গরুর পালের মধ্যেই গড়পড়তা দুধ দেওয়ার পরিমান বেড়ে গেছে। তার মানে কয়েক প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ক্রমাগতভাবে সতর্ক, কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন জাতের পশু বা উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব যাদের মধ্যে শুধু কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যগুলোই দেখা যাবে। এক সময় তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলো এত বেশী হয়ে যায় যে তারা সম্পুর্নভাবে এক নতুন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদে পরিণত হয়ে যেতে পারে, যার সাথে তাদের পূর্বপুরুষের প্রজনন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই মানুষ হাজার বছর ধরে বুনো নেকড়েকে পোষ মানিয়ে কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের কুকুরের সৃষ্টি জন্ম দিয়েছে (৪)। এখন যদি অন্য কোন গ্রহ থেকে কেউ আমাদের এই পৃথিবীতে এসে প্রথমবারের মত বিভিন্ন রকমের কুকুরগুলোকে দেখে, তাহলে তাদের পক্ষে কোনভাবেই অনুমান করা সম্ভব হবে না যে এরা এক সময় সবাই নেঁকড়ে প্রজাতির বংশধর (৪) ছিলো। ফার্মের মোটা মোটা মুরগী বা বিশাল বিশাল মাংসওয়ালা অষ্ট্রেলিয়ান গরুগুলোকে দেখে আমাদের যে ভিমরি খাওয়ার জোগাড় হয় তাদেরকে

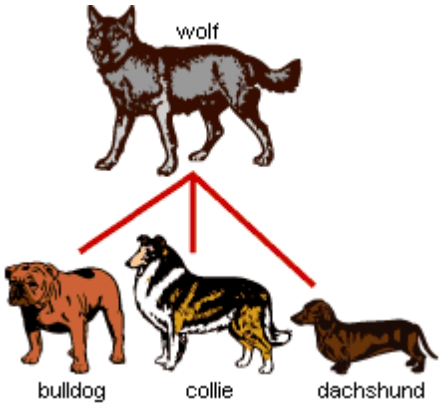

ছবি ১: নেকড়ে থেকে কুকুরের বিবর্তন। সৌজন্যেঃ
http://evolution.berkeley.edu/evosite/lines/images/le_dogs2.gif

এভাবেই কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে (এখন অবশ্য অনেক ধরনের কৃত্রিম পদ্ধতি এবং ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে)। তার মানে মানুষ কৃত্রিমভাবে নির্বাচন করে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি

করে আসছে সেই অনাদি কাল থেকেই! ডারউইন দেখলেন, এরকম কৃত্রিমভাবে নির্বাচিত প্রজননের থেকে তার আশে পাশে মানুষ প্রায় ১০ রকমের কবুতর তৈরি করেছে। এদের মধ্যে পার্থক্য এতখানিই যে, প্রাকৃতিকভাবে এদের সৃষ্টি হলে এদেরকে খুব সহজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বলে ধরে নেওয়া হত (৩)। তাহলে কি প্রকৃতিতেও এমনই কোন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন ঘটছে?

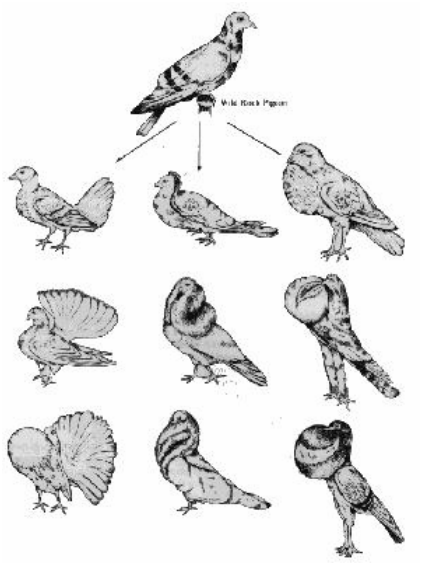

ছবি ২: কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরণের কবুতর।
সৌজন্যেঃ http://www.mun.ca/biology/scarr/Darwin's_pigeons.gif

ডারউইন আরও লক্ষ্য করলেন, আমাদের চারপাশের গাছ এবং প্রাণীরা যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করে তার বেশীরভাগই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। একটা পুরোপুরি বড় হওয়া কড মাছ বছরে প্রায় ২০ থেকে ৫০ লাখ ডিম পাড়ে, একটি মেপল বা আম বা জাম গাছে হাজার হাজার ফুল এবং ফল ধরে, কিন্তু এর বেশীরভাগই পূর্নাঙ্গ রূপ ধারণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করে, আমাদের দেশের ইলিশ মাছের কথাই চিন্তা করে দেখুন না। সমুদ্র থেকে নদীগুলোতে এসে তারা কি হারে ডিম পারে আর তাদের মধ্যে ক'টাই বা শেষ পর্যন্ত পুর্নাঙ্গ মাছে পরিনত হয়ে টিকে থাকতে পারে! বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে একটা কড মাছের ডিমের ৯৯% ই প্রথম মাসেই কোন না কোন ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, বাকি যা বেঁচে থাকে তার প্রায় ৯০% জীবনের প্রথম বছরেই কোন না কোনভাবে মৃত্যুবরণ করে (৮)। ডারউইনও এই একই জিনিস দেখিয়েছেন হাতীর বংশবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় হাতীর বংশবৃদ্ধির হার তুলনামুলকভাবে খুবই কম, কিন্তু তারপরও একটা হাতী তার জীবনে যে ক'টা বাচ্চার জন্ম দেয় তার মধ্যেও সবগুলি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। ডারউইন হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, হাতী অন্য সব প্রাণীর তুলনায় সবচেয়ে কম বংশবৃদ্ধি করেও তার ৯০-১০০ বছরের জীবনে প্রায় ৬ টি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ যদি সবগুলো বাচ্চা বেঁচে থাকে তাহলে এক জোড়া হাতী থেকে ৭০০-৭৫০ বছরে প্রায় ১৯০ লক্ষ হাতীর জন্ম হবে (৮)।

প্রকৃতিতে প্রায় সব জীবই এরকম বাড়তি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে, একটা ব্যকটেরিয়া প্রতি ২০ মিনিটে বিভক্ত হয়ে দুটো ব্যকটেরিয়ায় পরিনত হয়, হিসেব করে দেখা গেছে যে এরা সবাই বেঁচে থাকলে এক বছরে তারা বংশ বৃদ্ধি করে সারা পৃথিবী আড়াই ফুট উচু করে ঢেকে দিতে পারতো। একটা ঝিনুক কিংবা

কাছিম একবারে লাখ লাখ ডিম ছাড়ে, একটা অর্কিড প্রায় ১০ লাখ বীজ তৈরী করতে পারে (৩)। মানুষের জনসংখ্যার কথাই চিন্তা করা যাক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের এতখানি উন্নতি ঘটার আগে অর্থাৎ মাত্র এক-দেড়শো বছর আগেও শিশু মৃত্যর হার ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশী। (আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে, কৃত্রিমভাবে আমরা এখন একদিকে জন্ম নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছি, অন্যদিকে শিশু আধুনিক চিকিৎসার কল্যানে মৃত্যর হারও কমিয়ে আনতে পেরেছি)। তাহলে দেখায়া যাচ্ছে, এভাবেই সব জীব যদি বংশবৃদ্ধি করতে থাকতো, অর্থাৎ একেকটা জীব তার সারা জীবনে যতগুলো ডিম বা বাচ্চার জন্ম দিতে সক্ষম তার সব গুলো যদি টিকে থাকতো তাহলে এতদিনে পৃথিবীতে আর কারোরই থাকার ঠাঁই হতো না। আসলে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতিতে ঠিক এর উলটোটা ঘটছে - সংখ্যার দিক থেকে যত উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম হয় বা বেঁচে থাকে, তার তুলনায় তাদের বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বহু গুণ বেশী। শেষ পর্যন্ত এর মধ্যের ছোটটো একটা অংশই শুধু বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। যে কোন প্রজাতি হঠাৎ করে অনেক বেশী হারে বংশবৃদ্ধি করে ফেলতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি প্রাকৃতিক নিয়মেই বন্ধ হতে হবে, কারণ তাদের সবার বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমান খাদ্যের বা অন্যান্য সম্পদের প্রয়োজন তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডারউইন ভাবলেন, তাহলে প্রকৃতিতে প্রাণের এই বিশাল অপচয় এবং বাড়তি বংশবৃদ্ধির (Prodigality of Reproduction বা Over Production) ব্যাপারটার অবশ্যই কোন ব্যাখ্যা থাকতে হবে!

শুধু যে আমাদের চারপাশে অনেক বাড়তি প্রাণের জন্ম হয় তাই তো নয়, প্রত্যেক প্রজাতির জীবের নিজেদের মধ্যেই আবার অসংখ্য ছোট বড় পার্থক্য দেখা যায় - মানুষের কথাই ধরুন না, আমাদের একজনের সাথে আরেক জনের তো কোন মিল নেই। গায়ের রং এ পার্থক্য, চোখের রং এ, আকারে পার্থক্য, দেখতে একেক জন একেররকম, কেউ বা বেশী দিন বাঁচে, কেউ বা কম, কাউকে বেশী রোগে ধরে, কাউকে কম, কারও গায়ে বেশী শক্তি আবার কারও কম - এমন হাজারোতর পার্থক্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এর বিভিন্নরকম উদাহরণ দেখেছিলাম। বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন প্রজাতির শিশুরা তাদের বাবা-মার থেকে বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে, যৌন পদ্ধতি থেকে জন্মানো এই প্রতিটি প্রাণী বা উদ্ভিদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এর ফলে যে কোন প্রজাতির জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রচুর পরিমানে পার্থক্য বা *প্রকারণ*[*] দেখা যায় । সে সময় জেনেটিক্স বা বংশগতি বিদ্যার আবিষ্কার না হওয়ায় ডারউইন প্রকারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে পারেন নি, কিন্তু তিনি এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে সঠিকভাবেই সিধান্তে আসেন যে, প্রকৃতিতে সবসময় খাদ্য, বেঁচে থাকা, জায়গা, সঙ্গী নির্ধারণ, আশ্রয়, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে একধরনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলতে থাকে একই ধরনের প্রজাতির ভিতরের প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং এক প্রজাতির সাথে আরেক প্রজাতির মধ্যে। আবার প্রতিটি জীবের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা প্রকারণের কারণে এই অনন্ত প্রাকৃতিক সংগ্রামে কেউ বা সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়ে বেশীদিন টিকে থাকতে সক্ষম হয়, আর অন্যরা আগেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যে প্রকৃতি তুলনামুলকভাবে বেশী উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের টিকিয়ে রাখে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে,

---

[*] Variation শব্দটার অর্থ হিসেবে পার্থক্য, প্রকারভেদ, পরিবৃত্তি বা প্রকারণ দুটোই দেখা যায়, আমি এখানে প্রকারণ শব্দটাই ব্যবহার করছি; আবার Heridity শব্দটার জন্য বাংলায় অনেকগুলো প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যেমন, বংশগতি, বংশানুসৃতি, উত্তরাধিকার, জন্মগত বা বংশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। আমি এখানে Heridity বোঝাতে 'বংশগত বৈশিষ্ট্য'ই ব্যবহার করবো, যার অর্থ হচ্ছে বাবা এবং মা র থেকে পাওয়া জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলো যেগুলো তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়)।

একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে সংগ্রাম করে যারা টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তারাই শুধু পরবর্তী প্রজন্মে বংশধর রেখে যেতে পারে, এবং তার ফলে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোরই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অনেক বেশী প্রকটভাবে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ, যে প্রকারগুলো তাদের পরিবেশের সাথে অপেক্ষাকৃত বেশি অভিযোজনের (adaptation) ক্ষমতা রাখে, তাদের বাহক জীবরাই বেশীদিন টিকে থাকে এবং বেশী পরিমানে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এভাবে প্রকৃতি প্রতিটা জীবের মধ্যে পরিবেশগতভাবে অনুকূল বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের নির্বাচন করতে থাকে এবং ডারউইন প্রকৃতির এই বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়ারই নাম দেন প্রাকৃতিক নির্বাচন বা *Natural Selection.*

ডারউইনের সময় বিজ্ঞানীদের বংশগতি বিদ্যা বা জেনেটিক্স (genetics) সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। জীবাশ্ম বিদ্যা (Paleontology) বা ফসিল রেকর্ডও তখন তেমন জোড়দারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাবতেও অবাক লাগে ডারউইন কিভাবে এই সব জ্ঞান ছাড়াই বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন! তার এই বিবর্তন তত্ত্ব ইওরোপের খ্রিষ্ট ধর্মসহ অন্যান্য সব ধর্মের ভিতকেই টলিয়ে দিলো, আদম হাওয়ার গল্প পরিনত হল রূপকথায়, নুহের মহাপ্লাবনের সময় প্রজাতির নতুন করে টিকে যাওয়ার কেচ্ছা গেলো হাওয়ায় ভেসে। আগেই বলেছি, জীববিজ্ঞানে ডারউইনের মূল অবদান দু'টি, প্রথমত যুক্তি প্রমাণ উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যে, প্রাণের বিবর্তন ঘটছে সৃষ্টির আদি থেকে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) আর দ্বিতীয়তঃ এই বিবর্তন ঘটছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। হইচই পরে গেলো সারা বিশ্বেজুড়ে ১৯৫৮ সালে ডারউইন এবং ওয়ালেস এই তত্ত্বটা প্রস্তাব করার পর। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রজাতি বদলাচ্ছে - তা বিশ্বাস করা এক কথা, আর এই পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটছে সম্পুর্ণভাবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়, কোন সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ছাড়াই তা মেনে নেওয়া আরেক কথা!

সে সময়ের ইউরোপে প্রাণের সৃষ্টি সংক্রান্ত দর্শনের পুরোটাই ছিলো বিখ্যাত ঈশ্বরতত্ত্ববাদী উইলিয়াম প্যালের (William Paley, 1743-1805) সৃষ্টিতত্ত্ববাদ দিয়ে প্রভাবিত।

তিনিই বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা ঘড়ির যেমন একজন কারিগর থাকে তেমনি প্রত্যেকটা প্রাণেরও পিছনে একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে। ঘড়ির মত একটা জটিল জিনিস যেমন কারিগর ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না তেমনি এত জটিল অংগ প্রত্যংগ সম্পন্ন জীবগুলোও সৃষ্টিকর্তা ছাড়া পৃথিবীতে জন্মাতে পারে না। তাই ডারউইন এবং ওয়ালেস যখন দেখালেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত অন্ধ, অচেতন কিন্তু অনাকস্মিক এবং নিতান্তই একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু জীবের বিবর্তনই ঘটছে না, নতুন নতুন প্রজাতিরও

> সৃষ্টি হচ্ছে এবং ধাপে ধাপে জটিল থেকে জটিলতর প্রানেরও সৃষ্টি ও বিলুপ্তি ঘটছে তখন স্বভাবতই ইউরোপের রক্ষনশীল এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাথায় যেনো বাজ পড়লো।

তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিবর্তনবাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে। রেঁনেসা, পুঁজিবাদের বিকাশ, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদির কারণে তখন মহা প্রতাপশালী চার্চ্চের ক্ষমতা বেশ নড়বড়ে হয়ে উঠেছে ইওরোপে, ইচ্ছা করলেই তারা আর ডাইনী বানিয়ে কিংবা বাইবেলের বিরোধিতার অজুহাতে একে ওকে পুড়িয়ে মারতে পারছে না। তাই ডারউইন এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেও কম অপমান এবং সমালোচনার স্বীকার হতে হয়নি তাকে, ক্যারিক্যাচারি কার্টুন থেকে শুরু করে, গালিগালাজের ঝড় বয়ে যেতে থাকলো তার উপর। যেমন, নীচের ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল হর্নেট ম্যাগাজিনে, ১৮৭১ সালে। এ ছবিটি দেখলে বোঝা যায় ডারউইনের তত্ত্ব সে সময় ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের কি পরিমান গাত্রদাহের কারণ ঘটিয়েছিল; তারা বানরের দেহের সাথে ডারউইনের মুখমন্ডল জুড়ে দিয়ে এ ধরণের নানা বিদ্রুপাত্মক ছবি এঁকে ডারউইনকে তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল।

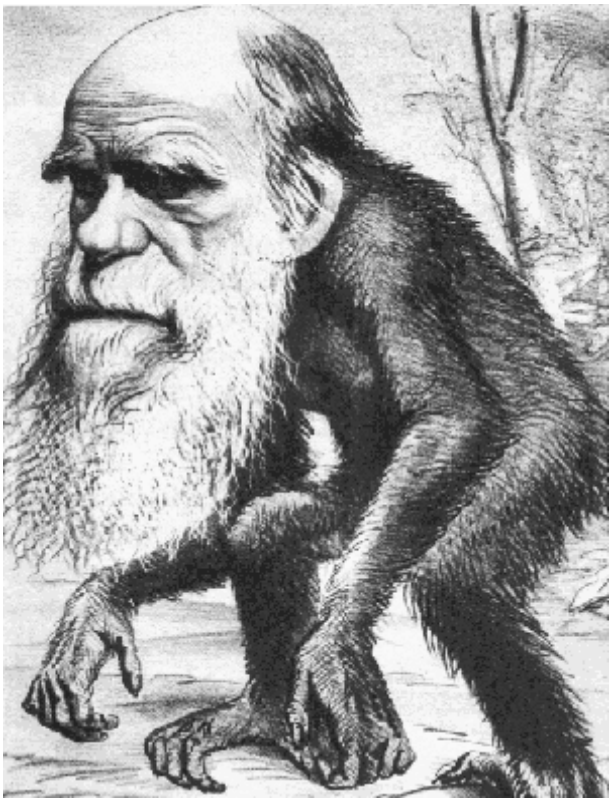

হর্নেট ম্যাগাজিনে (১৮৭১) প্রকাশিত একটি বিদ্রুপাত্মক ছবি
সৌজন্যে : **www.mun.ca/biology/ scarr/Darwin_as_Monkey.htm**

ডারউইন নিজে খুব বেশী উত্তর না দিলেও তার বন্ধুরা, **স্টিভেন হেন্সলো, টি এইচ হাক্সলি, জোসেফ ডাল্টন হুকার, অ্যাশা গ্রে** প্রমুখ, তার হয়ে লড়ে যেতে থাকেন। বিশেষ করে হাক্সলিকে তো তখন 'ডারউইনের বুল ডগ' বলেই ডাকা হত।

এপ্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা না বললেই নয় - একবার এক সভায় বিবর্তনের তীব্র বিরোধিতাকারী খ্রিস্টান ধর্ম বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স ডারউইনের তত্ত্বকে ঈশ্বরবিরোধী ব্যক্তিগত মতামত বলে আক্রমণ করেন। তখনই তিনি হঠাৎ করে সভায় উপস্থিত হাক্সলিকে উদ্দেশ্য করে জানতে চান তার দাদা এবং দাদীর মধ্যে কে আসলে বানর ছিলেন। তারই উত্তরে **হাক্সলি** বিবর্তনবাদের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বিশপকে তুলাধুণা তো করে ছাড়েনই বক্তৃতার শেষে এসে তিনি এও বলেন যে,

> 'যে ব্যক্তি তার মেধা, বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন ও বাগ্মিতাকে কুসংস্কার ও মিথ্যার পদতলে বলি দিয়ে বৌদ্ধিক বেশ্যাবৃত্তি করে, তার উত্তরসুরী না হয়ে আমি বরং সেইসব নিরীহ প্রাণীদের উত্তরসুরী হতে চাইবো যারা গাছে গাছে বাস করে, যারা কিচিরমিচির করে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় (৩)।'

এদিকে আবার বিগেল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিটজরয়ও আরেক কান্ড করে বসলেন সেই সভায়। তিনি বাইবেল হাতে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে বলতে থাকলেন যে, সব দোষ আসলে তারই, তিনি যদি ডারউইনকে তার জাহাজে করে বিশ্ব ভ্রমণে নিয়ে না যেতেন তাহলে ডারউইন এভাবে ধর্মের ক্ষতি করার সুযোগ পেতেন না। তবে অনেকেই মনে করেন যে, ফিটজরয়ের মানসিক সমস্যা ছিল এবং তিনি এর কিছুদিন পরে আত্মহত্যাও করেছিলেন। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে আজও অবধি বিতর্কের ও বিরোধিতার কোন শেষ নেই। যদিও মাইক্রো-বায়োলোজী, জেনেটিক্স, জিনোমিক্স ইত্যাদি আধুনিক জীববিজ্ঞানের শাখা যত এগিয়েছে, ততই অভ্রান্তভাবে প্রমাণ হয়েছে বিবর্তনবাদের সঠিকতা! কিন্তু তার ফলে ধর্মীয় অংশ থেমে যায়নি, বরং আমেরিকার মত জায়গায় তারা সরকার এবং প্রভাবশালী লোকদের সমর্থন পেয়ে ইদানীং মহাশক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে আর কুলাচ্ছে না দেখে এখন আই.ডি (ID or Intelligent Design) নামের মোড়কে পুরে নতুন করে সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রচার করার আপ্রাণ চেষ্টায় নেমেছে, এ নিয়ে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

সে যাই হোক, চলুন আমরা আবার ফিরে যাই ডারউইনের গল্পে। বিজ্ঞান তো তার তত্ত্বের পর চুপ করে বসে থাকেনি, নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে বার বার পুরনো তত্ত্বকে ঝালাই করে নেওয়াই তার কাজ। ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধণ, এমনকি বর্জন করে হলেও সে আরও আধুনিক এবং উন্নত তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসে। ডারউইনের সময় পর্যন্ত বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক কিভাবে কাজ করে তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন স্পষ্ট ধারণাই ছিলো না। আমরা ল্যামার্কের (জীন-ব্যাপটিষ্ট ল্যামার্ক, ১৭৪৪-১৮২৯) কথা শুনেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে, ডারউইনের আগে তিনিই প্রথম সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রজাতি সুস্থির নয়, এক প্রজাতি থাকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটে। যদিও তিনি যে পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন ঘটে বলে প্রকল্প দেন তা পরবর্তীতে সম্পুর্ণভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়। তিনি মনে করতেন

যে, জীবের যে অংগগুলো তার জীবনে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো আরও উন্নত হতে থাকে, আর যেগুলোর বেশী ব্যবহার হয় না সেগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় বা বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। তার মধ্যে একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় উদাহরণ হচ্ছে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে যাওয়ার গল্প, লম্বা লম্বা গাছের ডগা থেকে কঁচি পাতা পেরে খাওয়ার জন্য কসরত করতে করতে বহু প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে গিয়েছিলো। বিবর্তন সম্পর্কে এরকম একটা ভুল ধারণা এখনও প্রচলিত আছে, যা নিয়ে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রইলো। ল্যামার্ক আরও বললেন যে, একটি জীব তার জীবদ্দশায় ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে সেগুলো তার পরবর্তী প্রজন্মে বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয়। যেমন ধরুন, জুতো পরতে পরতে আপনার পায়ে যদি স্থায়ীভাবে ঠোসা পরে যায় তাহলে কি পরবর্তী প্রজন্মের পায়েও সেই ঠোসা দেখা যাবে! এখানেই কিন্তু শেষ নয়, তিনি সে সময়ের আরও অন্যান্য জীববিজ্ঞানীদের মত এটাও ভাবতেন যে, পরবর্তী প্রজন্মে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এক ধরণের মিশ্রণ ঘটে; যেমন ধরুন, বাবার গায়ের রং কালো আর মার গায়ের রং ফর্সা হলে ছেলেমেয়ের গায়ের রং মিশ্রিত হয়ে শ্যামলা হয়ে যেতে পারে! কিন্তু ডারউইন এটা ঠিকই বুঝে ছিলেন যে,

> কোন অঙ্গের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে জীবের বিবর্তন ঘটে না, প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করার জন্য শুধুমাত্র বংশগতভাবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে দেখা যায় তারাই দায়ী। যে বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি আপনার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আপানার দেহে পান নি, তার উপর বিবর্তন কাজ করতে পারে না। তিনি Origin of Species বইতে লিখলেন, 'Any variation which does not inherit is unimportant to us'।

কিন্তু ল্যামার্কের অন্য দু'টি তত্ত্ব নিয়ে ডারউইন বেশ বিপাকে পড়লেন, আসলেই কি জীবদ্দশায় অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়? সত্যিই কি বাবা মার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যায়? কিন্তু আসলেই যদি এভাবে বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটে তাহলে কি তার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বই ভুল প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে না? আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের অন্যতম প্রধাণ শর্তই হচ্ছে যে, প্রজাতির জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রকারণ বা Variation থাকতে হবে, যার ফলশ্রুতিতেই জীবের মধ্যে বেঁচে থাকার যোগ্যতায় ভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু এভাবে যদি কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো মিশ্রিত হয়ে যেতে থাকে তাহলে তো হাজার প্রজন্ম পরে সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে, প্রকারণ থাকবে কি করে? তখনও জেনেটিক্সের আবিষ্কার না হওয়ায় ডারউইন এর সদুত্তর দিতে পারলেন না, এমনকি কখনও কখনও তিনি ল্যামার্কের তত্ত্বকেই সঠিক বলে ধরে নিলেন। বিবর্তনবাদের বিরোধীরা সে সময় তার এই সংশয়কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহার করতেন।

অথচ তার সমস্যার সমাধান অবশ্যই দিতে পারতেন গ্রেগর মেন্ডেল (Gregor Mendel, ১৮২২–১৮৮৪), যিনি ১৮৬৫ সালেই তার জিনতত্ত্বটি প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি মা বাবার দুজনের মধ্যে বিদ্যমান বংশগতির একক বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে 'ফ্যাকটর' বলে আভিহিত করেছিলেন, তবে, পরবর্তীতে ১৯০৯

সালে Wilhem Ludvig Johannsen একে *জিন*[†] হিসেবে নামকরণ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ডারউইন মেন্ডেলের লেখাটা পড়ারই সুযোগ পেলেন না; আসলে সে সময় কেউই মেন্ডেলের আবিষ্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করায় তার এই গুরুত্বপুর্ণ কাজটা তখনকার মত হারিয়েই গেল কালের গহ্বরে। তারপর ১৯০০ সালের দিকে আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হল তার কাজ। আমরা অবাক হয়ে জানতে পারলাম, ডারউইন যে সমস্যাগুলো নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তার সমাধান ছিলো এক্কেবারেই তার হাতের ডগায়। মেন্ডেল দেখালেন যে, ছেলে মেয়ের প্রত্যেকটা বংশগত বৈশিষ্ট্য মা বাবার কোন না কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে। বাবা মার কোষের ভিতরের এই ফ্যাকটর বা জিনগুলো একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এখন আমরা জানি যে,

> জিন হচ্ছে ডি এন এ (DNA) দিয়ে তৈরি বংশগতির (inheritence) একক, যার মধ্যে মানুষের কোষের বিভিন্ন রকমের প্রোটিন তৈরির (এবং তার ফলশ্রুতিতেই কোষ তৈরি হয়) তথ্য বা কোড জমা থাকে। বাবা এবং মার যৌন কোষে এই জিনগুলো থাকে, তাদের ছেলে মেয়েরা নিজেদের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের জন্য দুজনের থেকে একটা করে জিন পেয়ে থাকে। এই জিনগুলোর মধ্যে কোনরকম কোন মিশ্রন ঘটে না এবং একটা বৈশিষ্ট্যের জিন আরেকটার উপর কোনভাবে নির্ভরশীল নয়।

অর্থাৎ, আপানার চোখের রং এর বৈশিষ্ট্যের সাথে নাকের আকারের বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্ক নেই, প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের জিন আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে। উত্তরাধিকার সুত্রে আপনি আপনার বাবা বা মার কাছ থেকে কোন একটা জিন হয় পাবেন না হয় পাবেন না, এর মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। একইভাবেই আপনার বাবা মাও তাদের পুর্বপুরুষ থেকে তাদের জিনগুলো পেয়ে এসেছে। এভাবেই, জিনগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে বিভিন্ন জীবের মাঝে। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই ব্যাপারটাকে, 'This argument can be applied repeatedly for an indefinite number of generations. Discrete single genes are shuffled independently through the generations like cards in a pack, rather than being mixed like the ingredients of a pudding' (5). আর এর আবিষ্কারটির ফলেই বিংশ শতব্দীর প্রথম ভাগে এসে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব সম্পর্কে অন্যতম প্রধান বিরোধটির নিরসন হলো।

এর পর গত একশো বছরে জেনেটিক্স এবং মাইক্রো-বায়োলজী বা অনু-জীববিদ্যা এগিয়ে গেছে অকল্পনীয় গতিতে, ক্রোমসম, ডি এন এ এবং মিউটেশন থেকে শুরু করে মানুষের জিনোমের পর্যন্ত হিসাব বের করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। এখন তো জীববিজ্ঞানীরা রীতিমত দাবী করছেন যে, যদি একটা ফসিলের চিহ্নও পৃথিবীর বুকে কোনদিন না পাওয়া যেতো তাহলেও আজকের জেনেটিক্সের জ্ঞান এবং আমাদের ডি এন এর মধ্যে লেখা পুর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর হাজার বছরের ইতিহাস থেকেই বিবর্তনের তত্ত্ব প্রমাণ করে ফেলা যেতো। এ বিষয়টি আপাতত তোলা থাক পরবর্তীতে কোন এক অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য। বরং এখন খুব সংক্ষেপে দেখা যাক, জেনেটিক্সের আলোয় ডারউইনের

[†] gene, জিন এর বাংলা হিসেবে বংশগতির একক, প্রজনন কণা, বংশাণু ইত্যাদি অনেক শব্দই ব্যবহার করা হয়,তবে আমি এখানে জিন শব্দটাই ব্যবহার করবো।

বিবর্তন তত্ত্বের মূল চালিকাশক্তি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াটি কিভাবে পরিবর্ধিত হয়ে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ ধারণ করলো।

আগেই দেখেছি, জীবন সংগ্রামে যে সব *প্রকারণ* বা variation জীবকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে বেশী সুবিধা করে দেয় সেই সব জিনের অধিকারী জীবই বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে এবং যারা পরিবেশের সাথে কম খাপ খাওয়াতে পারে তাদের তুলনায় তারা অনেক বেশী সন্তান রেখে যেতে সক্ষম হয়। ডারউইন বিবর্তনকে দেখেছিলেন ব্যক্তিগত প্রাণী বা উদ্ভিদ এবং প্রজাতি লেভেলে, এখন বোঝা যাচ্ছে যে, বিবর্তন ঘটছে জিন, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং জনপুঞ্জের লেভেলে (৭)। একটি প্রজাতির কতগুলো জীব যখন নিজেদের মধ্যে যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে তখন তাদের জনপুঞ্জের সবার জিনের সমষ্টিকে একসঙ্গে বলে *জিন পুল* (gene pool)। একদিকে যৌন প্রজননের মাধ্যমে প্রতি প্রজন্মে জিনের অদলবদল হয়, আবার অন্য দিকে, জিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন ঘটার ফলে কখনও কখনও তার ডি এন এর গঠন বা সংখ্যায়ও পরিবর্তন ঘটে, যাকে বলা হয় *মিউটেশন* (Mutation) বা পরিব্যাপ্তি। মিউটেশনের মাধ্যমেই প্রকারণের সৃষ্টি হচ্ছে আর তারপর যৌন প্রজননের মাধ্যমে তা সমগ্র জিন পুলে মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে একটা জনপুঞ্জের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বা দুটি জীবের জীনগত পরিবর্তনকেই বিবর্তন বলে ধরে নেওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র জনপুঞ্জের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যাবে না যে বিবর্তন ঘটছে। তার মানে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এরকম -

> বেশী উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব বেশী দিন বেঁচে থাকে এবং বেশী বংশবৃদ্ধি করতে পারে, তার ফলে তাদের জিন অনেক বেশী পরিমানে প্রবাহিত হয় সন্তানদের মধ্যে। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে একটি জীবের জনসংখ্যায় জিনের ফ্রিকোয়েন্সি বা মাত্রা বদলাতে থাকে – পরবর্তী প্রজন্মে কিছু জিন বেশী প্রবাহিত হয় আর কিছু জীনের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জনপুঞ্জে জিনের পরিবর্তন ঘটতে থাকাকেই বিবর্তন বলে। জেনেটিক্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বংশগত প্রকারনগুলোর প্রভেদমুলক প্রজননকে (differential reproduction) বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন; আর, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া মাধ্যমে কোন প্রজাতির জনসংখ্যায় জীন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন বলে বিবর্তন(৬)।

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবের অভিযোজন (Adaptation) ক্ষমতা বাড়তে থাকে, আর তারই ফলশ্রুতিতে সে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্য আরও যোগ্যতর হয়ে গড়ে ওঠে। তবে এখন আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াও আরও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমেও বিবর্তন ঘটতে পারে; যেমন ধরুন, মিউটেশনের কথা আমরা একটু আগেই শুনেছি, এছাড়াও জীবের একাংশের মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা (Geographical separation), জেনেটিক ড্রিফট (genetic drift), বহিরাগমন ইত্যাদির কারণেও বিবর্তন ঘটে থাকে। এ বিষয়গুলো এবং এখান থেকে কিভাবে প্রজাতির উদ্ভব বা বিলুপ্তি ঘটে তা নিয়ে পরের কোন পর্বে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

পরিবেশ এখানে নির্বাচনী শক্তি (Selection agent) হিসেবে কাজ করে, এবং যেহেতু সময় এবং অঞ্চল বিশেষে পরিবেশ বদলে যায় তাই বিভিন্ন পরিবেশে জীবের বিভিন্ন প্রকারণ নির্বাচিত হয়। আর তাই, কোন জায়গার জীবকে বিচার করতে হবে তার চারপাশের পরিবেশের আপেক্ষিকতায়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে একটা প্রজাতি তার পরিবেশের সাথে আরও বেশি করে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে অর্থাৎ তার অভিযোজনক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটা প্রজাতির যে সব জীবের দেহে সেই পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অনুকূল বৈশিষ্ট্যের জিন বেশি থাকে তারাই বেঁচে থাকে, বেশী পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করে এবং তাদের জিন অনেক বেশী পরিমাণে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে পরে। যেমন ধরুন, বরফ যুগে কানাডার মত দেশে একটি প্রজাতির টিকে থাকার জন্য যে জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলো বেশী গুরুত্ব ছিলো তারা এখনকার পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নাও পালন করতে পারে।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় শিল্প বিপ্লবের আগে এবং পরে পেপার্ড মথের (Biston betularia) বিবর্তন থেকে। বিজ্ঞানীরা গত ১৪০ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পেপারড মথের এই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। এই ইংলিশ মথ প্রজাতিটিকে হাল্কা এবং গাঢ় - দুটি রং এই দেখতে পাওয়া যায় এবং যেহেতু তারা একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, তাদের মথের মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রজননও ঘটতে দেখা যায়। শুধুমাত্র এক জোড়া জিন দিয়ে এদের গায়ের রং নিয়ন্ত্রিত হয়। এদেরকে সাধারণত লিচেন নামের এক ধরনের পরজীবি ছত্রাক দিয়ে ঢাকা গাছের ডালের উপর দেখা যায়। ১৮৪৮ সালের যাদুঘরের এক সংগ্রহ থেকে পাওয়া পরিসংখ্যাণ থেকে জানা যায় যে, ইংল্যান্ডের ম্যঞ্চেস্টার শহরে সে সময়ে গাঢ় রং এর মথের সংখ্যা ছিল ১% এরও কম, আর বাকি প্রায় ৯৯% মথই ছিলো হাল্কা রং এর। এই পোকাগুলো পাখিদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। হাল্কা রং এর লিচেন দিয়ে ঘেড়া গাছের ডালগুলোতে বসে থাকা গাঢ় রং মথগুলো খুব সহজেই পাখিদের চোখে পরতো এবং তাদের শিকারে পরিণত হত। অন্যদিকে হাল্কা রং এর পোকাগুলো গাছের ডালের রং এর সাথে মিশে থাকায় তাদেরকে পাখিরা সহজে আর দেখতে পেত না, এবং তার ফলে তারা শিকারি পাখিদের হাতে ধরাও পরতো কম। এর ফলশ্রুতিতে দেখা গেল যে, প্রতি প্রজন্মে হাল্কা রং এর জিন ধারণকারী মথের সংখ্যা সমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে প্রাকৃতিক পরিবেশের অনেক পরিবর্তন ঘটে, কারখানা থেকে আসা ঝুল, ময়লা দিয়ে বাতাস অনেক বেশী দুষিত হয়ে পরতে থাকে। এই পরিবেশ দূষণের কারণে গাছের ডালের উপরের লিচেনগুলো হয় মারা যায় অথবা তাদের উপর এক ধরনের গাঢ় রং এর প্রলেপ পরে যায়। তার ফলে দেখা গেলো যে, এই মথগুলোর চারপাশের পরিবেশই ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে, এখন গাঢ় রং এর প্রলেপ পরা লিচেন এর উপর বসে থাকা হাল্কা রং এর মথগুলো আগের থেকে অনেক বেশী করে পাখিগুলোর চোখে পরছে। আর তার ফলে যা হবার তাই হল - এবার হাল্কা রং এর মথের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে গেলো এবং গাঢ় রং এর মথের সংখ্যা বেড়ে যেতে শুরু করলো। কিছুদিন পরে আরেক পরিসংখ্যানে দেখা গেলো যে, পেপারড মথের জনসংখ্যার ৯৫% ই গাঢ় রং এর মথে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এখানেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়, এর পরপরই ইংল্যান্ডে বাতাসের দূষণ রোধের জন্য আইন পাশ করানো হয় এবং দ্রুত বাতাসের দুষণও কমতে শুরু করে। আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে আবারও ঠিকই দেখা গেল যে, হাল্কা রং এর মথের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। পাখিদের দিয়ে আরোপিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে আমরা দেখলাম যে কি করে একটা জিন পুলের মধ্যে জিনের ফ্রিকোয়েনসি বদলে যেতে পারে, এবং তার ফলে সেই জনপুঞ্জে কি করে বিবর্তন ঘটে।

ভাবলে খুবই আবাক হতে হয় যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত এত সহজ একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা বিবর্তনের তত্ত্বটা আসলে কতখানি গভীর। আজকে প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে শুরু করে জেনেটিক্স, জিনোমিক্স, অনু-জীববিজ্ঞান কিংবা ওষুধ বা কিটনাশক তৈরি, এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্ত শাখা অচল হয়ে পড়বে বিবর্তনের মুল তত্ত্বটাকে অস্বীকার করলে। ডারউইন প্রায় দেড়শো বছর আগে যা বলে গেলেন তার সারকথা প্রমাণ করতে আমাদের এতদিন লেগে গেলো। আর জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যতই চাঞ্চল্যকর এবং আধুনিক আবিষ্কার দিয়ে ভরে উঠতে থাকলো ততই নতুন করে প্রমাণ হতে থাকলো বিবর্তনের যথার্থতা। দ্বিপদী এই মানব প্রজাতিটার বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সেই আদি এক কোষী প্রাণী থেকে সৃষ্টি হওয়ার জন্য কোন স্রষ্টার প্রয়োজন হয়নি, অন্য সব জীবের মতই কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটেছে তার। যতই সে নিজেকে ঘিরে শ্রেষ্ঠত্বের মায়াজাল তৈরি করুক না কেনো, সে আর সব প্রাণীর মত এই প্রকৃতিরই একটি অংশমাত্র।

চলবে .....

References:

১) নারায়ণ সেন, ২০০৪, ডারউইন থেকে ডি এন এ এবং চারশো কোটি বছর, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।
২) সুশান্ত মজুমদার, ২০০৩, চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, প্রকাশকঃ সোমনাথ বল, কোলকাতা,ইন্ডিয়া।
৩) ডঃ ম আখতারজ্জামান, ২০০২, বিবর্তনবাদ। হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৪) http://evolution.berkeley.edu/evosite/lines/IVAartselection.shtml
5) http://www.bbc.co.uk/education/darwin/leghist/dawkins.htm
6) Dr. Berra, M, Tim (1990), Evolution and the Myth of Creationism. Stanford
7) http://www.talkorigins.org/faqs/modern-synthesis.html
8) Ridley, Mark (2004), Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, United Kingdom.
9) http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/da_vinci_leonardo.shtml
10) http://www.talkorigins.org/faqs/geohist.html

নভেম্বর ৬, ২০০৫

লেখক পরিচিতিঃ বন্যা (রাফিদা) আহমেদ বর্তমানে আমেরিকায় পাবলিক হেলথ সেকটরে সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত। এর আগে কাজ করেছেন টেলি কমিউনিকেশনস ইন্ডাসট্রিতে, ফাইবার অপটিক্সের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে প্রায় ৭ বছর। লেখাপড়া করেছেন বায়োটেকনলজি এবং কম্পিউটার সায়েন্সে। ইমেইল : bonna_ga@yahoo.com